বুলিং আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে

হুমায়রাত হক প্রমি
২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:৪৭ এএম

কখনও আমরা ভাবি না- আমাদের মজা, হাসি, তামাশা বা সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট কারও মনের মধ্যে কেমন ঝড় তোলে। আমরা দেখি না কার মুখ শুকিয়ে যায়, কার চোখ ভিজে ওঠে আর কার ভেতর জমে থাকা ব্যথা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বডি শেমিং ও বুলিং এখন আর সাধারণ সামাজিক অসভ্যতা নয়, এটি নিঃশব্দে মানুষের ভেতরকে ধ্বংস করে দেওয়া এক ভয়াবহ মানসিক সহিংসতা। আর এই সহিংসতার শিকার হয়ে যখন একজন তরুণ জীবন হারায়- তখন প্রশ্নটা আরও তীক্ষè হয়ে ওঠে : আমরা কবে বুঝব বুলিং আসলে কতটা প্রাণঘাতী? বর্তমানে বাংলাদেশে বুলিং একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এখানে একজন আরেকজনকে হেয় করতে পারলেই মনে হয় দিনশেষে শান্তি মেলে তাদের। আর বুলিংয়ের শিকার সব থেকে বেশি হয় তার সহপাঠী-বন্ধুদের মধ্য দিয়ে যার বড় মাধ্যম বডি শেমিং। কার চেহারা কেমন, কার আকৃতি কেমন, কে দেখতে স্মার্ট নয়- এসব নিয়ে আলোচনা যেন এক সামাজিক রীতি। মনে করা হয়- মজা করছি, হালকাভাবে বলছি কিন্তু আমরা ভাবিও না ওই ব্যক্তিটির ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলছে। ছোটবেলা থেকে স্কুল, কলেজ, সামাজিক পরিবেশ, এমনকি পরিবারেও এই তামাশা চলতেই থাকে। ধীরে ধীরে মানুষ নিজের শরীরকে ঘৃণা করতে শুরু করে। আত্মসম্মান ক্ষয়ে যায়, মানসিক চাপ বেড়ে ওঠে, আর শেষমেশ হতাশার অন্ধকারে ঢুকে পড়ে।

সম্প্রতি যে ঘটনা- ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী মুশফিকের মৃত্যু। ঠিক মৃত্যু নয়, কারণ তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তার দোষ? তার শারীরিক আকৃতি। তার অনেক সহপাঠীর কাছ থেকে জানা যায় যে, তাকে স্কুল থেকেই এই বডি শেমিংয়ের শিকার হতে হয়েছে, যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলমান ছিল। এমনকি মৃত্যুর পরও ডেডবডিকে নিয়ে আমাদের সমাজ হাসাহাসি করছে। আমরা এতটাই স্বার্থপর, এতটাই অসচেতন, যে বারবার মানুষ মারা যাওয়ার পরও শিক্ষা নিই না। বুলিং আজ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালে আবদ্ধ নয়। এর বড় একটা ক্ষেত্র অনলাইন মিডিয়া। এখানে সবাই সমালোচক, সবাই বিচারক, সবাই মজা করতে জানে কিন্তু কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না।

বডি শেমিংয়ের একটা ভয়াবহ দিক হলো এটি মানুষকে চুপচাপ মেরে ফেলে। শারীরিক আঘাত যেমন চোখে দেখা যায়, মানসিক আঘাত তেমন দেখা যায় না। তাই আমরা ভেবেই নিই কিছুই হয়নি। অথচ অপর প্রান্তে মানুষটি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে, ক্ষয়ে যায় আর এই দৃশ্যহীন ক্ষতই বিপজ্জনক।

আমরা ভাবি আমরা আধুনিক, প্রগ্রেসিভ কিন্তু মানসিক দিককে তুচ্ছ করি। বুদ্ধিমত্তার জন্য আমরা সৃষ্টির সেরা জীব। কিন্তু দিনে দিনে জনসংখ্যা বাড়লেও বাড়ছে না মানুষের সংখ্যা অর্থাৎ মনুষ্যত্ব। নতুবা স্রষ্টা প্রদত্ত জিনিস, শারীরিক আকৃতি নিয়ে আমরা কেন একজনকে মজা করার মাধ্যমে আত্মহত্যার ইতিহাস লিখে দিচ্ছি।

আমাদের উচিত এসব দিক পরিহার করা। সমস্যার সমাধান কেবল সচেতনতা নয়- দায়বদ্ধতা। পরিবার, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্রে- সর্বত্র বুলিংবিরোধী নীতিমালা প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা দরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা থাকা উচিত। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন- মানুষের ভেতরে সহমর্মিতা ফিরিয়ে আনা। তবেই এই উগ্র মানুষের কাছ থেকে প্রজন্মকে বাঁচানো সম্ভব।

হুমায়রাত হক প্রমি : শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়